বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের মহান নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অমূল্য ও অসামান্য অবদান রেখেছেন যা বাংলাদেশের জনগণ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নানা আন্তর্জাতিক বাধা ও কতিপয় বৃহৎ শক্তির হুমকির মুখেও অসীম সাহসের সঙ্গে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণের স্বপক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

শ্রীমতী গান্ধী ১৯১৭ সালে ১৯ নভেম্বর এলাহাবাদে ভারতের বিখ্যাত নেহেরু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতা খ্যাতনামা আইনজীবী মতিলাল নেহেরু; পিতা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোগামী নেতা ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং মাতা শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরু।

১৯৩৪-৩৫ সালে তিনি কিছুকাল কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আদর করে 'প্রিয়দর্শিনী' নামে ডাকতেন। পরবর্তীকালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সামারভিল কলেজে ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৯৪২ সালে ফিরোজ গান্ধীর সাথে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পন্ডিত নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে ফিরোজ গান্ধী ছিলেন ভারতীয় লোকসভার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ

রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বিখ্যাত নেহেরু পরিবারের সদস্য হিসেবে কৈশোর জীবনেই রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ ঘটে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করেন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৪-১৯৬৬ কালপর্বে তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে তাসখন্দে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন, এবং ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৬৬-১৯৭৭ এবং ১৯৮০-১৯৮৪ এই দুই কালপর্বে মোট পনের বছর সাফল্যের সঙ্গে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই সময়কালে তিনি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অনেক সাহসী এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল থেকেই ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এক সঙ্কটময় প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শ্রীমতী গান্ধীর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, মানবিকতাবোধ ও আদর্শিক অবস্থান থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক ও সুদূরপ্রসারী পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন করে তিনি তাঁর সুচিন্তিত নীতিমালা সূত্রায়ন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকেই তিনি বাংলাদেশের অসহায় নিপীড়িত জনগণের পক্ষে দৃঢ় ও সাহসী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতম গণহত্যা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বেতারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায়ও শ্রুত হয়। ভারতীয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করে, যা ২৭ মার্চ ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই দিন ভারতের লোকসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জঘন্যতম হামলার কঠোর নিন্দা জানান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জোরালো সমর্থন জানিয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেছিলেন, 'পূর্ববাংলায় একটা নতুন কিছু ঘটেছে, একবাক্যে দেশের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। আমরা একে অভিনন্দন জানিয়েছি, এ কারণে নয় যে আমরা অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক, বরং এইসব মূল্যবোধ তুলে ধরতে আমরা সব সময় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করি, এবং নির্ভীকভাবে প্রচার করি, তারই জন্য।'

তাঁর এ বক্তব্য একদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক জনসমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে, অন্যদিকে দু'একটি পরাশক্তির, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন ও সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা ভারত সরকারের নীতি ও কর্মপরিকল্পনায় বিশেষ প্রভাব রাখে। ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ ভারতীয় লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহে বিনা দ্বিধায় বলা হয়–

'This house expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. A massive attack by armed forces, despatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations....

However, situated as India is and bound as the people of the sub-continent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this house cannot remain indifferent to macabre tragedy being enacted so close to our border….

This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of people which amounts to *genocide.*

This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph. The house wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the whole hearted sympathy and support of the people of India.'

২৫ মার্চ পরবর্তী সময়ে নয় মাসব্যাপী অবরুদ্ধ বাংলাদেশে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণের ওপর দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ ও নির্বিচার গণহত্যা চালানোর কারণে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ তাদের জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষায় বাধ্য হয়ে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই বিপুল সংখ্যক অসহায় মানুষের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকারকে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে বিরাট সংখ্যক শরণার্থীর ন্যূনতম জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করা অত্যন্ত

কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল। এই ভয়াবহ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্যসভার এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'পরিস্থিতির বাস্তবতা উপলব্ধির চেষ্টা না করে সরকারের সমালোচনা করা সহজ। ইউরোপের যে কোনো দেশে দশ হাজার শরণার্থী উপস্থিত হলে, সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে একটা বহ্নিমান অবস্থার সৃষ্টি হতো। অন্যদিকে ভারত বিশ্বের দরিদ্রতম একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও তার সাধ্যমত চেষ্টা করছে।' বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রয়োজনে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারতের জনগণকে অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হয়েছে।

বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি দুই লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন ভারতীয় মিত্র বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানরা এবং অকাতরে জীবনও দান করেছেন। একটি দেশের স্বাধীনতার জন্য অন্য দেশের সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের এই আত্মত্যাগ বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

আন্তর্জাতিক জনমতকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনার জন্য শ্রীমতী গান্ধী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই সময় ভারত সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বিশ্বের ৬৭টি রাষ্ট্রে ১৮টি সরকারি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিল।

পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালে আগস্ট মাসের দিকে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করলে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি নতুন ও জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শ্রীমতী গান্ধী এ সময় উদ্বিগ্ন হয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষায় কতিপয় সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়াসহ চব্বিশটি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার আবেদন জানিয়ে বার্তা প্রেরণ। এই বার্তায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সামরিক জান্তা এই বিচারের প্রহসন করছে। বার্তায় রাষ্ট্রপ্রধানদের অনুরোধ করা হয় তাঁরা যেন বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষায় দৃঢ় এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ক'রে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁকে অবিলম্বে এই বিচারের প্রহসন বন্ধ করতে বলেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে কোনো মূল্যে বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে অবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক গণহত্যা বন্ধ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিনাশর্তে মুক্তি ও সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান।

বৈদেশিক কূটনীতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আর একটি বড় সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিয়ে আসা, যার চূড়ান্ত অভিপ্রকাশ ঘটে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনে, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে এনেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে এই চুক্তি সম্পাদন ছিল অপরিহার্য।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে কয়েকটি বিমান ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের আশঙ্কায় ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথ সামরিক কমান্ড গঠন করে এবং ৩ ডিসেম্বরের একতরফা হামলার জবাবে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় যখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর হাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত, তখন ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। সেদিন ভারতীয় লোকসভায় প্রদত্ত ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের জনগণ তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত, আর ভারতের জনগণ যুদ্ধ করছে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, তাঁরা বর্তমানে একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সহযাত্রী, একই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে। তিনি বলেছিলেন–

'বিরাট বাধার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে, বাংলাদেশ সরকারের উপর্যুপরি অনুরোধের প্রেক্ষিতে, সব দিক সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা ক'রে ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে। এই মুহূর্তে আমাদের মন পড়ে রয়েছে এই নতুন রাষ্ট্রের জনক শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমার সঙ্গে এই সভা বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁদের সহকর্মীদের অভিনন্দন জানাবেন।'

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন, 'বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছে তাদের রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং এমন এক সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে ধর্মে, বর্ণে বা নারী-পুরুষে কোনও বৈষম্য থাকবে না। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকবে এবং যে কোনও ধরনের উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করবে। ভারতও এই সব আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।'

মুক্তিযুদ্ধে দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় এবং আমাদের সগৌরব বিজয় অর্জিত হয়। আত্মসমর্পণের পরপরই বিকেল ৫-৩০ টায় শ্রীমতী গান্ধী অপেক্ষমাণ লোকসভার সদস্যদের সম্ভাষণ করলেন-

'মাননীয় স্পিকার স্যার, আমার একটি ঘোষণা দেয়ার আছে, যার জন্য হয়তো কিছুক্ষণ ধরে আপনারা অপেক্ষা করছেন। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত রাজধানী। এই ঐতিহাসিক ঘটনায়, লোকসভা এবং সমগ্র জাতি আনন্দে ভাসছে। এই ঐতিহাসিক বিজয়ের ক্ষণে আমরা বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। আমরা অভিনন্দন জানাই মুক্তিবাহিনীর সাহসী সদস্য ও তরুণদের – তাঁদের সাহস ও আত্মোৎসর্গ করার প্রবণতাকে। আমরা আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীসহ সকল প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য গর্ব অনুভব করছি।

আমরা আশা ও বিশ্বাস করি যে, এই নতুন রাষ্ট্রের জনক শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনগণের মাঝে যথাযোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হবেন এবং শান্তি, প্রগতি ও উন্নতির পথে বাংলাদেশকে চালিত করবেন। তাঁরা সকলে মিলে তাঁদের সোনার বাংলার উন্নতি এবং অর্থবহ ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারেন। তাঁদের জন্য রয়েছে আমাদের শুভেচ্ছা।'

১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর লন্ডন হয়ে দেশে ফেরার পথে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে দিল্লীতে কয়েক ঘন্টার জন্য যাত্রাবিরতি করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সার্বিক সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান এবং তাঁর মুক্তির বিষয়ে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি ও জনমত গঠনের জন্য তিনি শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর সম্মানে আয়োজিত সেই জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতের জনগণের উদ্দেশে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, 'শেখ সাহেব তাঁর জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্বাধীনতার এবং তিনি তা পূরণ করেছেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বাংলাদেশের শরণার্থীদের সসম্মানে দেশে ফেরত পাঠাবো, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সবরকম সাহায্য করবো এবং বাংলাদেশের অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনবো। আমিও আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি।'

১৯৭২-এর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাদর আমন্ত্রণে শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁরই সম্মানে নির্মিত ইন্দিরা মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে ভূয়সী প্রশংসা করে এক আবেগময় ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ সরকার চাইলে যে কোন সময় ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। ১৭ মার্চ ১৯৭২ ভারতীয় সৈন্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরের সময় বঙ্গবন্ধুর অভিপ্রায় অনুযায়ী ২৫ বছর মেয়াদী ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তাঁর দেহরক্ষীর গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার পর ১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর তারিখে এই মহিয়সী নেত্রী মৃত্যুবরণ করেন।

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা, তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং অনন্য অবদানের উল্লেখ ব্যতীত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি দৃঢ় ও সাহসী অবস্থান নিয়েছিলেন বলেই আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল। এর ফলেই অতি দ্রুত বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের পক্ষাবলম্বন ছিল তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী অধ্যায়। অত্যন্ত প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূলে এনে কিংবা প্রতিপক্ষের অনেককে নিরপেক্ষ করে শ্রীমতী গান্ধী সেই সময়ে যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাহস প্রদর্শন করেছেন, নীতির প্রশ্নে অনমনীয় থেকে যেভাবে বাংলাদেশের বিজয় ত্বরান্বিত করেছেন সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি ও কূটনীতির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে তা অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিরাজ করবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের মহান নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর সরকার এবং ভারতের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের বহুমাত্রিক অবদান এদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।